ক্রীড়াব্যক্তিত্ব কাজী আবদুল আলীমের সাধনা

wj‡L‡Qb তর ণ সরকার

কাজীবাড়ির কথা,
কাজী আবদুল আলীমের কথা

ব্রিটিশ আমল থেকে পুরান ঢাকার রোকনপুরের কাজীবাড়ি বেশ বিখ্যাত ছিল। পঞ্চাশের দশকে কাজীবাড়ির পরিচিতিতে যুক্ত হয় নতুন মাত্রা। মূলত কাজী আবদুল আলীমের ভূমিকার কারণে এ দেশের ক্রীড়াঙ্গনে পরিচিত হয়ে ওঠে কাজী পরিবার। পঞ্চাশের দশক থেকে আশির দশক পর্যন্ত ক্রীড়াঙ্গনের বার্ষিক প্রতিযোগিতায় একাধিক বিষয়ে স্বর্ণপদক নিয়ে যেতেন তিনি এবং তার ভাইবোনেরা।

চল্লিশের দশকের শেষ ভাগ থেকে শুরু হয় কাজী আবদুল আলীমের মাঠজীবন। ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন অ্যাথলেটিকে তৎকালীন প্রাদেশিক চ্যাম্পিয়ন। জিমন্যাস্টিক ও বক্সিংয়ে ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চ্যাম্পিয়ন। পোলভল্টে তিনি ভেঙে দিয়েছিলেন সমগ্র পাকিস্তানের রেকর্ড।

তরুণ বয়সে তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন খেলাধুলা করবেন, খেলতে অনুপ্রাণিত করবেন। শুরু করলেন নিজের ঘর থেকেই। তাঁর ভাইবোনদের নিয়ে এলেন মাঠে। প্রত্যেকেই রাখলেন সাফল্যের স্বাক্ষর। বিশেষত তার ৩ বোন কাজী জাহিদা, কাজী নাসিমা ও কাজী শামীমা ছিলেন তৎকালীন ক্রীড়াঙ্গনের উজ্জ্বল তারকা। পাকিস্তান আমলে মেয়েদের জাতীয় প্রতিযোগিতার শুরুর বছরে চ্যাম্পিয়ন হন তার বোন স্কুল ছাত্রী কাজী জাহিদা। পঞ্চাশের দশক থেকে আশির দশক পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পদক চলে আসতো তিন বোনের কাছে। পরিবার থেকে শুরু করে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তিনি তৈরি করেছেন শত শত ক্রীড়াবিদ। যারা বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনে অবদান রেখেছেন এবং রেখে চলছেন। পঞ্চাশের দশকে বাঙালি মেয়েদের মাঠে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে তিনি অন্যতম পথিকৃৎ।

খেলাধুলা জীবনের লক্ষ্য থাকায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে বিদেশ থেকে শারীরিক শিক্ষায় স্নাতক ডিগ্রি নিয়ে যুক্ত হন শারীরিক শিক্ষা পেশায়। ১৯৫৮ সাল থেকে জাতীয় কোচ। শারীরিক শিক্ষা কলেজের অধ্যক্ষ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া পরিচালক ইত্যাদি দায়িত্ব পালন করেছেন। যুক্ত ছিলেন বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গঠন প্রক্রিয়ার সঙ্গে। পালন করেছেন বিভিন্ন ক্রীড়া সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

ক্রীড়া বিষয়ে লেখালেখির ক্ষেত্রেও তিনি অনন্য। পাকিস্তান আমলে তার লেখা ‘দৌড়ঝাঁপ নিক্ষেপ’ ছিল বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম ক্রীড়াবিষয়ক গ্রন্থ। এরপর প্রকাশিত হচ্ছে তার ক্রীড়াবিষয়ক বিভিন্ন গ্রন্থ। তিনি লিখে চলেছেন ক্রীড়াবিষয়ক গ্রন্থ।

লেখালেখির জগতে কাজী আবদুল আলীম পরিচিত নাম। রূপকথা, হাসির গল্প, জ্ঞান বিজ্ঞানের সংকলন ইত্যাদি বিষয়ে লেখা কাজী আবদুল আলীমের গ্রন্থ পাঠক মহলে গ্রহণযোগ্যতা পেয়ে আসছে দীর্ঘদিন ধরে। ১৯৬৭ সাল থেকে এ দেশের তরুণদের কাছে তার সম্পাদিত মহাপুরুষদের বাণী সংবলিত ‘বাণী চিরন্তনী’ গ্রন্থটি সমাদৃত হয়ে আসছে।

সম্প্রতি কয়েক দিন রোকনপুরের কাজী বাড়িতে কাজী আবদুল আলীমের সঙ্গে

সাপ্তাহিক ২০০০-এর পক্ষ থেকে আলাপচারিতা হয়। এ সময় তার বেড়ে ওঠা, ৫০-এর দশকে পুরান ঢাকা, খেলোয়াড়ি জীবন, ক্রীড়া শিক্ষা ও ক্রীড়াঙ্গন পরিস্থিতি নিয়ে কথা হয় ২০০০-এর। মাঠ থেকে ফেরার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তিনি ২০০০কে বলেন, 'ম্যাট্রিক পাসের পর মনে হলো এবার আমার পথ বেছে নিতে হবে। কেউ কবিতা লেখে, কেউ নাটক করে, কেউ সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চা করে। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম খেলোয়াড় হবো। ভর্তি হলাম জগন্নাথ কলেজে। কলেজের খেলাধুলায় তখন হিন্দু ছাত্রদের একাধিপত্য। মুসলিম ছাত্ররা খেলাধুলায় প্রায় ছিলই না। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর শুরু হলো পশ্চিম পাকিস্তানিদের একাধিপত্য। এ পরিস্থিতিতে পশ্চিম পাকিস্তানিদের চেয়ে খেলাধুলায় এ দেশের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করার চেষ্টায় নিয়োজিত হই। শুরু করি সাধনা। প্রতিদিন ভোরবেলায় উঠে নামাজ পড়ে চলে যেতাম মাঠে। কবি নজরুল কলেজ মাঠে প্র্যাকটিস করতাম। মাঠের আগে বাহাদুর শাহ পার্কে ৩০-৪০ বার চক্কর দিতাম। কলেজ থেকে ফিরে কখনো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠ, আবার কখনো পুরান ঢাকার কোনো মাঠে চলে যেতাম। চর্চা চলতো সন্ধ্যা পর্যন্ত।

তখন জগন্নাথ কলেজের চ্যাম্পিয়ন ছিলেন নিভৃতি নাগ (লাট্টু)। তার সম্পর্কে খোঁজ নিলাম। চর্চা দেখলাম। তাকে ভালো করে স্ট্যাডি করে নিজেকে প্রস্তুত করলাম। ১৯৪৮ সালে জগন্নাথ কলেজে হাই জাম্প, লং জাম্প, পোলভল্ট, শর্টপুট, ৪০০ মিটার দৌড়সহ ১৩টি ইভেন্টে অংশ নিয়ে চ্যাম্পিয়ন হলাম।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ভাষা আন্দোলন ও সংশ্লিষ্ট কয়েকটি প্রসঙ্গ

১৯৪৮ সালেই তিনি অ্যাথলেটিকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান চ্যাম্পিয়ন হন। ১৯৫০ সালে তিনি ভর্তি হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সময় একটি ঘটনা তিনি জানান ২০০০কে। 'আমি মেধাবী ছাত্র ছিলাম না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন পাসকোর্স ছিল। অনেক চেষ্টা করেও ভর্তির সুযোগ পাচ্ছিলাম না। এ অবস্থায় বিএ পাস কোর্সে ভর্তির জন্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ হলের তৎকালীন প্রাধ্যক্ষ ড. ওসমান গণির কাছে গিয়ে খেলোয়াড় কোটায় ভর্তি করতে অনুরোধ করলাম। খেলাধুলায় কোনো পদক পেয়েছি কিনা জিজ্ঞেস করে প্রাপ্ত পদকসহ তার সঙ্গে দেখা করতে বললেন। রোকনপুরের বাসা থেকে বস্তায় করে বিভিন্ন পদক এনে রাখলাম ড. ওসমান গণির বাসায়। ৩টি বস্তা থেকে পদক বের করার পর স্যার বললেন, তোমাকে ভর্তির ব্যবস্থা করা হবে। এরপর

ভর্তি হয়ে গেলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে।'

'৫০-এর দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম তারকা ছাত্র ছিলেন কাজী আবদুল আলীম। ১০ ফুট সাড়ে ১০ ইঞ্চি লম্বা গৌরবর্ণের দীর্ঘদেহী কাজী আবদুল আলীম তখন অ্যাথলেটিকে প্রাদেশিক চ্যাম্পিয়ন। জিমনাস্টিক ও বক্সিংয়ে রয়েছে উল্লেখযোগ্য সাফল্য। ক্যাম্পাসের পরিচিত মুখ কাজী আবদুল আলীম পঞ্চাশের দশকে যুক্ত হয়ে পড়েন ভাষা আন্দোলনে। ভাষা সৈনিক গাজীউল হক ২০০০কে জানান, 'ভাষা আন্দোলনের লিফলেট বিভিন্ন হলে পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব পালন করেছেন কাজী আবদুল আলীম। সাইকেল দিয়ে তিনি বিভিন্ন হলে লিফলেট পৌঁছে দিতেন।'

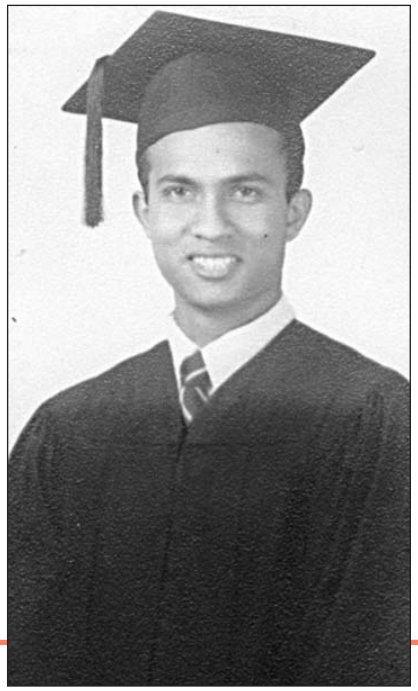

কাজী আবদুল আলীম বলেন, 'রোকনপুর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতাম সাইকেল দিয়ে। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে সাইকেল ছিল আভিজাত্যের ব্যাপার। সাইকেল ছিল খুব কম। সাইকেলের মাধ্যমে হলে হলে লিফলেট পৌঁছানোর কাজটি সহজে করে দিতে পারতাম। কাজটি আমাকে দেয়ার কারণ হচ্ছে, একজন খেলোয়াড় লিফলেট পৌঁছানোর কাজ করবে- এ ধরনের সন্দেহ কেউ করবে না। হলে প্রবেশের সময় কখনো কোনো পাহারারত সৈনিক বলে উঠেছে, 'আলীম সাহাব ইয়ে হামারা গ্রাহি হে'। আলীম সাহেব আমার পরিচিত লোক। কিন্তু যদি জানতো আমি ভাষা আন্দোলনের লিফলেট বহন করে এনেছি, তৎক্ষণাৎ ধরে জেলে পুরতো।'

কাজী আবদুল আলীমের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবস্থায় ১৯৫৫ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় পাকিস্তান অলিম্পিক। সকল অলিম্পিকের একটি সম্মানজনক ইভেন্ট হচ্ছে ডিকাথালন। ১০টি ইভেন্টে সর্বোচ্চ পয়েন্টধারী খেলোয়াড়কে ঘোষণা করা হয় ডিকাথালন চ্যাম্পিয়ন হিসেবে। তিনি জানান, '১৯৫৫ সালের পাকিস্তান অলিম্পিকে অংশ নিয়ে ১০টির মধ্যে ৯টিতে আমি সর্বোচ্চ পয়েন্ট পাই। বাকি ১টি ইভেন্টে জয় না পেলেও আমার বিজয় ছিলো নিশ্চিত। এ অবস্থায় কর্তৃপক্ষ আকাশ কালো করার অজুহাতে বাকি ১টি ইভেন্ট স্থগিত করে এবং পরে আর করা হয়নি। শুধু একজন বাঙালি হওয়ার কারণে সেদিন আমাকে ডিকাথালন চ্যাম্পিয়ন থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। ১৯৫৫ সালে পূর্ব পাকিস্তানে এসেছিলেন বিশ্ব অলিম্পিকের ডিকাথালন চ্যাম্পিয়ন বব ম্যাথাইয়াস। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মাঠে বব ম্যাথাইয়াস আমাকে পরিচয় করে দেন 'এ গ্রেট ডিকাথালন ম্যান'

হিসেবে। এই ঘটনার পর আমার আর কোন দুঃখবোধ ছিল না।' তিনি আরো বলেন, তখন ক্রীড়াঙ্গনে পশ্চিম পাকিস্তানিরা বিভিন্নভাবে এ দেশের খেলোয়াড়দের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করতো।'

তিনি জানান, 'বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে সকাল-বিকাল কাটতো মাঠে। দুপুর বেলায় ক্লাস। এরপর মাঠে অ্যাথলেটিক চর্চায়। বিকেলে মধুর ক্যান্টিনে। সন্ধ্যায় জিমনেসিয়ামে গিয়ে জিমন্যাস্টিক চর্চা। ফলে সিনেমা দেখা হতো না। বান্ধবীদের কেউ কেউ আগ্রহী হলেও সব সময় আগ্রহ প্রকাশ থেকে বিরত থেকেছি। জড়িয়ে পড়িনি প্রেমে। খেলাধুলার সাধনায় বিঘ্ন ঘটতে পারে। আমাদের সময়ে মেয়েদের সংখ্যা ছিল কম। আর মুসলিম মেয়েরা ছিল হাতেগোনা। সাধারণত দ্বিতীয় বর্ষ পার হওয়ার আগেই মেয়েদের বিয়ে হয়ে যেতো। অধিকাংশই ত্যাগ করতো বিশ্ববিদ্যালয়।'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি বিএ পাস করার পর ১৯৫৫ সালে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। এরপর ১৯৫৬ সালে ইতিহাস বিভাগে স্নাতকোত্তর কোর্সে ভর্তি হন। এবার আর ভর্তির জন্য অনুরোধ করতে হয়নি। উল্টো হল কর্তৃপক্ষের আহ্বানে তিনি এবার ভর্তি হন এবং ভর্তির টাকা বহন করে হল কর্তৃপক্ষ।

১৯৫৬ সালে ইতিহাসে এমএ কোর্স সম্পন্ন করেন। এ সময় ক্রীড়াবিষয়ক পড়াশোনার জন্য ৩টি স্কলারশিপ তার নামে মঞ্জুর হয়। প্রথম দু'টিতে কোর্স সম্পন্ন করার পর বাধ্যতামূলক ৫ বছর সরকারি চাকরি করার শর্ত ছিল। তৃতীয়টিতে এ ধরনের শর্ত ছিল না। তিনি বেছে নেন এশিয়া ফাউন্ডেশনের শর্তহীন স্কলারশিপ। স্কলারশিপের অধীনে যুক্তরাষ্ট্রের অরিগন বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৫৬ থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত পড়াশোনা করে শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য শিক্ষায় স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন।

কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, বিকেএসপি : নেশা পেশা সব একাকার

তারুণ্যের সূচনায় তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন খেলোয়াড় হবেন। আর বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'টি বিভাগ থেকে এমন ডিগ্রি অর্জনের পর সিদ্ধান্ত নিলেন, ক্রীড়া শিক্ষা পেশায় যুক্ত হবেন। যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফেরার পর পাকিস্তান অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে জাতীয় কোচ হিসেবে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত হলেন। পূর্ব পাকিস্তান থেকে তিনি প্রথম জাতীয় কোচ হিসেবে নিয়োগ পান।

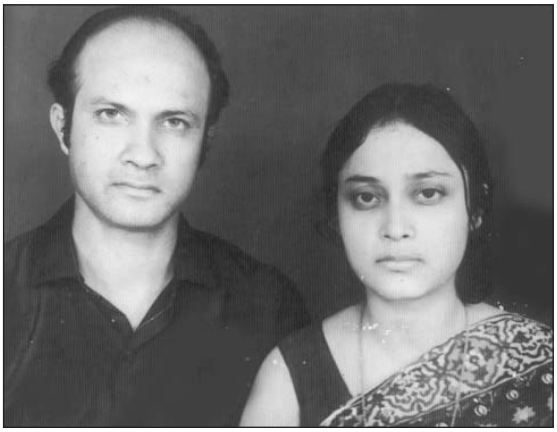

সস্ত্রীক কাজী আব্দুল আলীম

১৯৫৮ থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত তিনি জাতীয় কোচের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬২ সালে তিনি যুক্ত হন নতুন কর্মক্ষেত্রে, নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ে। ময়মনসিংহে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য তখন ড. ওসমান গণি। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে ভূমিকার কারণে ড. গণির প্রতি আবদুল আলীম সর্বদা কৃতজ্ঞ। ড. গণি আহ্বান জানালেন নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্রীড়া পরিচালক হিসেবে যোগ দিতে। কাজী আবদুল আলীম বলেন, 'কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় নতুন বিশ্ববিদ্যালয়। ছাত্রসংখ্যা প্রায় ৫০০। যাদের আগে খেলার তেমন অভিজ্ঞতা নেই। শুরু করি প্রশিক্ষণ। অমানুষিক পরিশ্রম করে গড়ে তুলি দল। সে বছর আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ভলিবলে চ্যাম্পিয়ন ও ফুটবলে রানার্স আপ হয়। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা খেলাধুলায় ক্রমশ ভালো করতে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মাঠে নিয়ে আসতে উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। এ ক্ষেত্রে সফলতাও এসেছিল। শিক্ষক, কর্মকর্তারা মাঠে নিয়মিত খেলতে আসতেন।'

ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান। এই সুযোগটাকে কাজে লাগাতে চেষ্টা করি। আয়োজন করি শিক্ষকদের জন্য নৌকাবাইচ, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য নৌকাবাইচ প্রতিযোগিতা। তৈরি করি 'স্যাডল ক্লাব'। পাঞ্জাব থেকে ঘোড়া এনে ঘোড়া দৌড়ের ব্যবস্থা করা হয়।

১৯৬৫ সালে পাকিস্তান সরকার লাহোর, করাচি ও ঢাকায় খেলাধুলার উন্নতির জন্য ৩টি কোচিং সেন্টার প্রতিষ্ঠা করে। বর্তমানে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ ভবনটি ছিল তৎকালীন জাতীয় কোচিং সেন্টার। পরিকল্পনা ছিল, জাতীয় কোচিং সেন্টারকে কেন্দ্র করে একটি ক্রীড়া কমপ্লেক্স গড়ে তোলা হবে। কিশোর-তরুণরা যাতে এখানে অবস্থান করে প্রশিক্ষণ নিতে পারে, তার সে ব্যবস্থা ছিল জাতীয় কোচিং সেন্টারে। ভবনটি তখন দু'তলা ছিল। নিচ তলায় জিমনেসিয়াম এবং ওপরের তলায় ছিল প্রশিক্ষণার্থীদের থাকার ব্যবস্থা। জাতীয় কোচিং সেন্টার, ঢাকা প্রতিষ্ঠা হলে কাজী আবদুল আলীম পরিচালক নিযুক্ত হন। তিনি পরিচালক থাকাকালে কোচিং সেন্টারের অবকাঠামো গড়ে উঠেছিল।

মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি জাতীয় কোচিং সেন্টার ভবনে বসবাস করতেন। তিনি জানান, 'মুক্তিযুদ্ধের সময় জাতীয় কোচিং সেন্টার ব্যবহৃত হতো মুক্তিযোদ্ধা তথা বিচ্ছু বাহিনীর প্রশিক্ষণের কাজে। বিচ্ছু বাহিনীর প্রয়োজনীয় শারীরিক শিক্ষা ছিল না। এ জন্য প্রায় সময় ওরা ধরা পড়ে যেতো। আমি ওদের স্বল্পকালীন শারীরিক ফিটনেসের প্রশিক্ষণ দিয়ে ছেড়ে দিতাম। সহজে দৌড়ঝাঁপ দেয়ার কৌশলগুলো শিখিয়ে দিতাম। ওরা আসতো খেলোয়াড়ের বেশে। পাকিস্তানি বাহিনী এ জন্য কোন সন্দেহ করতে পারেনি। স্বল্পকালীন ট্রেনিংপ্রাপ্তদের মধ্যে পোলভল্ট খেলোয়াড় সিরাজ উদ্দিনসহ কয়েকজন শহীদ হন। '৭১-এর মার্চের শুরু থেকে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে সমস্ত অফিস-আদালত বন্ধ ছিল। কিন্তু জাতীয় কোচিং সেন্টার একদিনের জন্যও বন্ধ ছিল না। একটিও বোমা পড়েনি কোচিং সেন্টারে। কারণ মুক্তিযোদ্ধারা জানতেন, কোচিং সেন্টার ব্যবহৃত হতো মুক্তিযুদ্ধের কাজেই। মুক্তিযুদ্ধের পর জাতীয় কোচিং সেন্টার আবার ব্যবহৃত হয়েছে ভিন্ন কাজে। সারা দেশ থেকে অস্ত্র জমাদানের জন্য মুক্তিযোদ্ধারা থাকতেন জাতীয় কোচিং সেন্টারের আবাসিক কক্ষগুলোতে'।

১৯৭৪ সাল পর্যন্ত জাতীয় কোচিং সেন্টারের পরিচালকের দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে তিনি এ দেশের ক্রীড়া প্রশিক্ষণ কাজের নেতৃত্ব দেন। ১৯৭৪ সালে তিনি ঢাকা শারীরিক শিক্ষা কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে যোগ দেন। তিনি জানান, 'এ সময় এডুকেশন অ্যাটাশে হিসেবে আমাকে দিল্লিতে নিয়োগদানের সিদ্ধান্ত হয়েছিল। কিন্তু খেলাধুলায় দেশে অবদান রাখতে বাংলাদেশেই নিয়োগদানের সিদ্ধান্ত হয় এবং এ প্রেক্ষিতে ফিজিক্যাল এডুকেশন কলেজে যোগদান করি। তখন ফিজিক্যাল এডুকেশন নিয়ে তাচ্ছিল্য ছিল। কলেজের মাঠ ছিল গোচারণের ক্ষেত্র। দায়িত্ব গ্রহণ করার পর এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটালাম। কলেজের মাঠ পরিচ্ছন্ন করা হলো। কলেজের ছাত্রদের বিভিন্ন দেশে বৃত্তির মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করলাম। সুইমিং পুলসহ খেলার কয়েকটি ক্ষেত্র তৈরি করলাম।

ঢাকা ফিজিক্যাল এডুকেশন কলেজের বর্তমান অধ্যক্ষ আবদুল হক এককালে সহকর্মী ছিলেন কাজী আবদুল আলীমের। অধ্যক্ষ আবদুল হক ২০০০কে জানান, 'কাজী আবদুল আলীম ছিলেন মাঠপাগল মানুষ। নিজে মাঠে থাকতে পছন্দ করতেন। ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের মাঠে নিয়ে খেলাধুলা করতেন। তিনি সব সময় নিজে মাঠে উপস্থিত হয়ে খেলাধুলার প্রশিক্ষণ দিতেন। ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকরা মাঠে উপস্থিত হলে উনি খুব খুশি হতেন। স্বভাবে সহজ-সরল কাজী আবদুল আলীম কারো কাজ সমস্যায় এগিয়ে যেতেন সবার আগে। কারো কোনো সমস্যা সমাধানের জন্য তাকে অনুরোধ করলে হোক বা না হোক তিনি চেষ্টা করতেন। এজন্য ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের মধ্যে তিনি জনপ্রিয় শিক্ষক ছিলেন।'

ফিজিক্যাল এডুকেশন কলেজে অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালনের সময় তিনি ক্রীড়াঙ্গনের আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত হন। বিভিন্ন ক্রীড়া ফেডারেশনের সমন্বয় সংস্থা ইস্ট পাকিস্তান স্পোর্টস ফেডারেশনের বাংলাদেশে নতুন নাম হয় জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ। ১৯৭৬ সাল থেকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের অবৈতনিক জেনারেল সেক্রেটারির দায়িত্ব পালন করেন। তখন ক্রীড়া পরিষদের চেয়ারম্যান ছিলেন তার বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের বন্ধু ও সহকর্মী খেলোয়াড় হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ। প্রসঙ্গত, তারা দু'জন একসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ হলের অনেক খেলায় অংশ নিয়েছেন। চ্যাম্পিয়ন হতেন কাজী আবদুল আলীম। কোনো কোনোটিতে এরশাদ হতেন রানারআপ।

ঢাকা শারীরিক শিক্ষা কলেজের অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালনকালে তিনি প্রথম প্রবর্তন করেন ক্রীড়া সঙ্গীত। 'খেলা খেলা খেলা যেন বিশ্ব মাঝে আনন্দেরই মেলা' শীর্ষক গানটিকে কলেজের ক্রীড়া সঙ্গীত হিসেবে ঘোষণা করেন। কলেজের খেলাধুলার আগে গাওয়া হতো গানটি। কাজী আবদুল আলীম জানান, '১৯৭৬ সালে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের দায়িত্বে আসার পর জাতীয় ক্রীড়া সঙ্গীত প্রবর্তনের উদ্যোগ নেই। আমি অবশ্য 'খেলা খেলা খেলা যেন বিশ্ব মাঝে আনন্দেরই মেলা' গানটিকে জাতীয় ক্রীড়া সঙ্গীত হিসেবে ঘোষণার প্রস্তাব দেই। কলেজের সঙ্গীতকে জাতীয় ক্রীড়া সঙ্গীত না করে একটি নতুন ক্রীড়া সঙ্গীত চালুর সিদ্ধান্ত হয়। 'বাংলাদেশের দুরন্ত সন্তান, আমরা দুর্বার' শীর্ষক গানটি এভাবে আমাদের জাতীয় ক্রীড়া সঙ্গীত হিসেবে চালু হয়।

প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এসে এ দেশের খেলাধুলার উন্নতির জন্য ক্রীড়াঙ্গন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে কথা বলেন। কাজী আবদুল আলীম জানান, 'প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রপতি থাকা অবস্থায় দেশের খেলাধুলার উন্নতির জন্য মতামত শুনতে আমাকে এরশাদের মাধ্যমে ডেকে নিয়ে যান। এ সময় আমি ভারতসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব স্পোর্টসের আদলে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব স্পোর্টস প্রতিষ্ঠা করা এবং প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শারীরিক শিক্ষার শিক্ষক নিয়োগের মাধ্যমে ব্যাপক প্রশিক্ষণের পরামর্শ দেই। জিয়াউর রহমান তখন বলেন, স্পোর্টস ইনস্টিটিউট এখনই প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। কিন্তু সারা দেশের স্কুলে শারীরিক শিক্ষায় শিক্ষিত শিক্ষক নিয়োগ দেয়া সম্ভব নয়। কারণ এতো শিক্ষক তৈরি করার মতো প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে নেই। তিনি বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব স্পোর্টস প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যোগ নিতে পরামর্শ দেন।

সরকারি কর্মকর্তা রুস্তম আলী, ক্রীড়া শিক্ষাবিদ মেহেদী বিল্লাহ খান মজলিশ আর আমি ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ার জন্য জমি খুঁজতে লাগলাম। সাভারের জিরানীতে জায়গা পছন্দ করা হলো। ১০০ একর ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়। আমাকে প্রথম পরিচালক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হলো, শুরু হলো কর্মযজ্ঞ। এ সময় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা আশরাফউদ্দিন খুব পরিশ্রম করেন। মাটি কেটে সমান করা, সুইমিংপুল, মাঠ, জিমনেসিয়াম ইত্যাদি নির্মাণ করা হলো। প্রস্তুতি যখন প্রায় সম্পন্নের পথে, তখন ১৯৮২ সালে আমাকে সেখান থেকে বদলি করে দেয়া হলো। বদলে যায় প্রতিষ্ঠানের চরিত্রও। বলা যায়, একটি স্বপ্নের অপমৃত্যু ঘটানো হলো। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব স্পোর্টস (বিআইএস)-এর নাম পরিবর্তন করে রাখা হলো বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি)।

পরিকল্পনা ছিল ঢাকা শারীরিক শিক্ষা কলেজ চলে আসবে বিআইএসএ। অন্যদিকে মোহাম্মদপুরের ঢাকা শারীরিক শিক্ষা কলেজটিকে মেয়েদের কলেজে রূপান্তরিত করা হবে। বিআইএস হবে একটি গবেষণা ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান। যেখানে কোচরা প্রশিক্ষণ নেবে, ছাত্ররা খেলাধুলা শিখবে। সারা দেশের খেলাধুলায় মেধাবীদের চিহ্নিত করে ভর্তি করা হবে বিআইএসএ। এখানে তারা পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলার চর্চা ও প্রশিক্ষণ নেবে। আধুনিক ক্রীড়া গবেষণানির্ভর। খেলাধুলার আন্তর্জাতিক অঙ্গন থেকে আমরা পিছিয়ে আছি গবেষণায়। খেলাধুলার আন্তর্জাতিক মান ক্রমশ উন্নত হয়। এ মানের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমরা অগ্রসর হতে পারিনি। ক্রীড়া বিষয়ে গবেষণা ও প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠিত বিকেএসপিতে এখন মেধাবীদের পরিবর্তে আত্মীয়স্বজনদের ঢোকাতে ব্যস্ত এখন কর্মকর্তারা।'

১৯৮২ সালে আবার যোগ দেন ঢাকা শারীরিক শিক্ষা কলেজ। ১৯৮৯ সালে অবসর নেন। তবে অবসর নেয়ার ৭-৮ মাস আগে তাঁকে বদলি করা হয়েছিল রাজশাহী শারীরিক শিক্ষা কলেজে। অনেকটা শাস্তির মতো ব্যাপার। বদলির বিষয়টি নিয়ম বহির্ভূত ছিল বলে তিনি জানান।

খেলা বিষয়ক লেখালেখি : উদ্দেশ্য খেলার প্রসার

তাঁর মতে, 'খেলাধুলার উন্নতির জন্য সারাদেশে দরকার হাজার হাজার কোচ। যারা তৈরি করবেন খেলোয়াড়। কিন্তু আমাদের মতো দরিদ্র দেশের পক্ষে এতো কোচ তৈরি করা সম্ভব নয়। এ উপলব্ধি পর আমেরিকা থেকে ফেরার পর বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে শুরু করি ক্রীড়া বিষয়ে লেখালেখি। ক্রীড়া বিষয়ে লেখাপড়ার মাধ্যমে যাতে উঠতি খেলোয়াড়রা কলা-কৌশল ও আইনকানুন জানতে পারে তার জন্যে লেখালেখি। অন্তত লেখা পড়ে যেন তারা আধুনিক কলা-কৌশলের সঙ্গে পরিচিত হতে পারে। গ্রামে-গঞ্জে ছাত্ররা যাতে বুঝতে পারে, সে জন্য বাংলা ভাষায় গ্রন্থ প্রণয়নের সিদ্ধান্ত নেই। আমেরিকা থেকে ফেরার দু'বছর পর ১৯৬০ সালে প্রকাশিত হয় প্রথম গ্রন্থ 'দৌড় ঝাঁপ নিক্ষেপ'। এরপর ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হয় ' ছোটদের জিমন্যাস্টিক ও মুক্তহস্ত ব্যায়াম', 'সাঁতার, ড্রাইভিং, ওয়াটার পলো', 'ভার উত্তোলন শরীর গঠন,' 'খেলাধুলার আইনকানুন,' 'ফুটবলের ছলাকলা,' ভলিবল বাস্কেটবল,' 'মজার খেলা হকি,' 'মুষ্টিযুদ্ধ', ফুটবলের আইনকানুন,' 'মেয়েদের ব্যায়াম', 'বল ছুটে ব্যাট উঠে,' 'ক্রীড়াজগৎ' ইত্যাদি গ্রন্থ। নিজেই প্রকাশক হয়ে প্রকাশ করেছিলাম 'দৌড় ঝাঁপ নিক্ষেপ'। একদিন দু'কপি দিয়ে এসেছিলাম বাংলাবাজারের নওরোজ কিতাবিস্তানে। দু'দিন পর বাসায় দেখি পোস্ট কার্ড। আপনার বই বিক্রি হয়ে গেছে। আরো বই পাঠান। পোস্টকার্ড পেয়ে যে কি খুশি হয়েছিলাম ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। এরপর বাংলাবাজার ও নিউমার্কেটের বিভিন্ন দোকানে বই দেই। বিক্রিও বেশ হতে থাকে। শুরু করি ক্রীড়া বিষয়ে আরো গ্রন্থ রচনা। পাঠকরা ক্রীড়া বিষয়ের বই গ্রহণ করায় আমি উৎসাহিত হই লেখায়। পাকিস্তান আমলে বাংলা ভাষায় প্রথম ক্রীড়া বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছিলাম। এরপর অন্যরাও এগিয়ে আসেন এ পথে।'

সাহিত্য চর্চা : জ্ঞান অথবা আনন্দ দান

খেলাধুলা ছাড়াও রূপকথা, হাসির গল্প ইত্যাদি রচনায়ও তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তবে

তাঁর সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে 'বাণী চিরন্তনী'। ২০টির বেশি মুদ্রণ হয়েছে গ্রন্থটির। তিনি জানান, ছোটবেলা থেকেই আমার অভ্যাস ছিল মহাপুরুষদের বাণী সংগ্রহ করা। কোথাও কোনো বাণী পেলে তৎক্ষণাৎ টুকে রাখতাম। এভাবে সংগ্রহ হয়ে যায় অসংখ্য বাণী। তার মধ্য থেকে নির্বাচিত বাণী নিয়ে ১৯৬৭ সালে প্রকাশ করলাম 'বাণী চিরন্তনী' গ্রন্থটি। 'বাণী চিরন্তনী' পাঠক মহলে সমাদৃত হওয়ায় ৪-৫টি অসাধু ব্যবসায়ী গ্রন্থের বাণী নিয়ে ভিন্ন নামে প্রকাশ করেন একই গ্রন্থ।'

রূপকথা লেখার প্রস্তুতিও শুরু করেছিলেন ছোটবেলায়। তিনি জানান, 'বিদেশী রূপকথা, হাসির গল্প বা কোথাও চুটকি পেলে আমি সংগ্রহ করে রাখতাম। এভাবে আমার সংগ্রহে চলে আসে বিপুলসংখ্যক গল্প। তা দিয়ে শুরু করি রূপকথার বই, হাসির বই প্রকাশ।' বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছে 'এশিয়ার রূপকথা', 'গ্রাম বাংলার ধাঁধা', 'দেশ-বিদেশের রূপকথা,' 'দেশ-বিদেশের সেরা গল্প,' 'ইউরোপের রূপকথা,' 'সুচিন্তিত মজার কথা,' 'আরব্য উপন্যাসের ছোট গল্প', 'আজব হলেও গুজব নয়,' 'হাসতে মানা' ইত্যাদি গ্রন্থ। লিখেছেন 'ইসলামের বাণী,' 'কোরানের বাণী', 'জ্ঞান বিজ্ঞানের খুঁটিনাটি' ইত্যাদি গ্রন্থ। এখনো লিখে চলেছেন অবিরাম। লিখেছেন পাঁচ শতাধিক পৃষ্ঠার আত্মজীবনী 'স্মৃতি কথা'। এতে ঢাকার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের বহু উপাদান পাওয়া যাবে। ঢাকার মহররমের মিছিল, রথযাত্রা, হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক, পুরান ঢাকার জনজীবন ইত্যাদি বিষয় স্থান পেয়েছে গ্রন্থে। গ্রন্থটি প্রকাশের অপেক্ষায় আছে।

কাজী আবদুল আলীমের প্রত্যেকটি বইয়ের একাধিক মুদ্রণ হয়েছে। আবার সকল বইয়ের প্রকাশক তিনি নিজে। তার ভাষায়, আমিই লেখক, প্রকাশক, পরিবেশক, বিক্রেতা ও অর্থ সংগ্রহকারী। সাইকেল দিয়ে বাংলাবাজার ও নিউমার্কেটের বিভিন্ন দোকানে বই দিয়ে আসতাম। আবার বিক্রির পর টাকা সংগ্রহ করতাম নিজেই। কাজীর বাড়িকে কেন্দ্র করে চলতো প্রকাশনার সমস্ত তৎপরতা।

কাজী পরিবারের সোনার ছেলেমেয়েদের কথা

কাজী পরিবারের বড় সন্তান ছিলেন কাজী আবদুল আলীম। তাঁকে কেন্দ্র করে ভাইবোনেরা হয়ে ওঠে একেকজন বিশিষ্ট খেলোয়াড়। কাজী আবু সাইয়িদ ১৯৬০ সালে শরীর গঠন প্রতিযোগিতায় 'মিস্টার ঢাকা' নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি হেভি আইটেমে খেলতেন। থ্রোয়িং, শর্টপুট, ডিসকাস ইত্যাদি তার খেলার বিষয়। কাজী আবদুল মমিন আন্তঃস্কুলে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন। খেলতেন হাই জাম্প, লং জাম্প ইত্যাদি। কাজী আবদুল বশির শর্টপুটে পূর্ব পাকিস্তান চ্যাম্পিয়ন ছিলেন ৬-৭ বছর। দৌড়েও তিনি খুব ভালো ছিলেন। ৪০-এর দশকে পুরান ঢাকার মুসলমান ছেলেরা খেলায় তেমন আসতো না। তিনি ও তার ভাইয়েরা ক্রীড়ায় সাফল্য রাখায় অন্যরা উৎসাহিত হয় মাঠে আসতে।

কাজী আবদুল আলীম জানান, 'উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা উইলস ও মিসেস উইলস পরিচালনা করতেন ছাত্রীনিবাস বটমলি হাউজ। মূলত খ্রীষ্টান মেয়েরা সেখানে থাকতো। তারাই ঢাকায় খেলাধুলা করতো। এছাড়া নারী শিক্ষা মন্দির, গেন্ডারিয়া বালিকা বিদ্যালয়, বাংলাবাজার উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়সহ অল্প কয়েকটি স্কুলে অল্প কিছু হিন্দু মেয়ে খেলাধুলা করতো। মুসলমান মেয়েরা খেলাধুলায় ছিল না।' এ অবস্থায় পরিবর্তন ঘটল পঞ্চাশের দশকে। তিনি নিজের বোনদের নিয়ে এলেন খেলার মাঠে। মুসলিম মেয়েরা মাঠে আসতে শুরু করে, হিন্দু মেয়েরাও ব্যাপক সংখ্যায় মাঠে আসতে থাকে।

কাজী আলীমের বোন কাজী জাহেদা সাপ্তাহিক ২০০০কে জানান, পঞ্চাশের দশকে তাঁর বড় ভাই তাকে নিয়ে আসেন মাঠে। প্রতিদিন ভোরবেলায় তিনি ভাইয়ের সঙ্গে চলে যেতেন বর্তমানে কবি নজরুল কলেজ মাঠে। মুসলিম হাইস্কুলের মাঠে গিয়ে দৌড়-ঝাঁপসহ তিনি বিভিন্ন ইভেন্টের চর্চা করতেন।

কাজী আবদুল আলীম বলেন, সবাই তখন মেয়েদের খেলা দেখতে আগ্রহী। কিন্তু নিজের সন্তানকে, বোনকে মাঠে দিতে রাজি ছিল না। আমাদের পরিবার ছিল রক্ষণশীল। মেয়েরা বাড়ির বাইরে ঘোড়ার গাড়িতে চলার সময় চারপাশে কাপড় দিয়ে পর্দা তৈরি করা হতো। এ রকম একটি পরিবারের মেয়েদের নিয়ে এলাম মাঠে। বোঝালাম, ছেলেমেয়ে মাঠে এলে নষ্ট হয় না, নষ্ট হয় বাজে আড্ডায় গেলে। ১৯৫৫ সালে জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় মেয়েরা প্রথম যোগ দেয়। সে বছর অংশ নিয়ে কাজী জাহেদা ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়নশিপ অর্জন করেন। আর দলগত চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করে বটমলি হাউজ। জাহেদা তখন বাংলাবাজার স্কুলের ছাত্রী। বিস্মিত হয়েছিলেন ক্রীড়ামোদীরা একজন স্কুলছাত্রীর এই বিজয় দেখে। কাজী জাহেদা ৫০, ১০০ ও ২০০ মিটার দৌড়, লং-জাম্প, হাই-জাম্প, ডিসকাস ইত্যাদি ইভেন্টে অংশ নিতেন।

কাজী জাহেদার ছোট কাজী নাসিমা। ফর্মসহ প্রায় ৩০ বছর খেলাধুলা করেছেন কাজী নাসিমা। 'এতো দীর্ঘদিন বাংলাদেশে আর কোনো খেলোয়াড় ফর্ম নিয়ে মাঠে ছিলেন বলে আমার জানা নেই-' ২০০০কে জানালেন কাজী নাসিমা। তিনি আরো জানান, লং-জাম্প, হাই-জাম্প, ডিসকাস, শর্টপুট, হ্যান্ডবল, ভলিবল, স্কেটিং ইত্যাদি বিষয়ে খেলেছেন। প্রতি বছর অর্জন করেছেন একাধিক স্বর্ণপদক। ১৯৬৬ সালে বিয়ের পর তিনি থ্রোয়িং ইভেন্টের চর্চা শুরু করেন। ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত তিনি মাঠে ছিলেন। ঐ বছরও তিনি ডিসকাসসহ কয়েকটি ইভেন্টে চ্যাম্পিয়ন হন। কাজী নাসিমা জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার পেয়েছেন, তবে সংগঠক হিসেবে। ক্রীড়াবিদ হিসেবে পুরস্কার না পাওয়ায় তাঁর দুঃখবোধ আছে।

বোনদের মধ্যে সবার ছোট কাজী শামীমা। ১৯৬২ সালে পাকিস্তান অলিম্পিকে তিনি ১০০ ও ২০০ মিটার দৌড় ও ব্রড জাম্পে জাতীয় চ্যাম্পিয়ন এবং রিলে দৌড় ও হার্ডলস-এ অর্জন করেন পুরস্কার। ঘোষিত হয়েছিলেন 'বেস্ট অ্যাথলেট অব মিট'। বোনদের মধ্যে সবচেয়ে মেধাবী ও সুন্দরী ছিল কাজী শামীমা- জানালেন কাজী আবদুল আলীম। হাসতে হাসতে তিনি আরো জানান, 'শামীমার পেছনে তখন ফেউ লেগে থাকতো। এজন্যে তাঁতে তাড়াতাড়ি বিয়ে দেয়া হয়েছিল।' কাজী আবদুল আলীমের অন্য দু'বোন ইতিমধ্যে জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার অর্জন করলেও কাজী শামীমা এখনো জাতীয় পুরস্কার লাভ করেননি। এ বিষয়ে কাজী আবদুল আলীম বলেন, 'নির্বাচকমন্ডলী কাজী শামীমার প্রতি অন্যায় আচরণ করে চলেছেন। শুধু কাজী পরিবারের মেয়ে হওয়ার কারণে তাকে পুরস্কার দেয়া হচ্ছে না।'

কাজী আবদুল আলীম : ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত কথা

কাজী আলীমের ভাইবোনের সকলেই খেলাধুলার চর্চা করতো। তারা ছিল ৫ ভাই ৯ বোন। কাজী আলীম জন্মগ্রহণ করেছিলেন নানাবাড়িতে। তাঁর মা ছিলেন পুরান ঢাকার জেলখানার পাশের অঞ্চল আলী নকীর দেউড়ির এক অভিজাত পরিবারের সন্তান। আলীমের বাবা কাজী আবদুল মতিন এবং দাদা কাজী আবদুর রউফ। পুরান ঢাকার কবি নজরুল কলেজ থেকে পাঁচ ভাই ঘাট লেন পর্যন্ত সড়কটির নাম কাজী আবদুর রউফ সড়ক। নামকরণ করা হয়েছে তার দাদার নামে। কাজী সমাজসেবী ছিলেন। কাজী আবদুর রউফ তার উত্তরাধিকারীদের জন্যে সুবিশাল বাসভবনসহ উল্লেখযোগ্য সম্পত্তি ওয়াকফ্ আওলাদ করে রেখে যান। উত্তরাধিকারীরা ভোগ করতে পারবে, কিন্তু বিক্রি করতে পারবে না। কাজী আবদুল আলীম বাস করেন কাজী আবদুর রউফের তৈরি করা কাজী বাড়ির বাসভবনের ২য় তলার একটি অংশে।

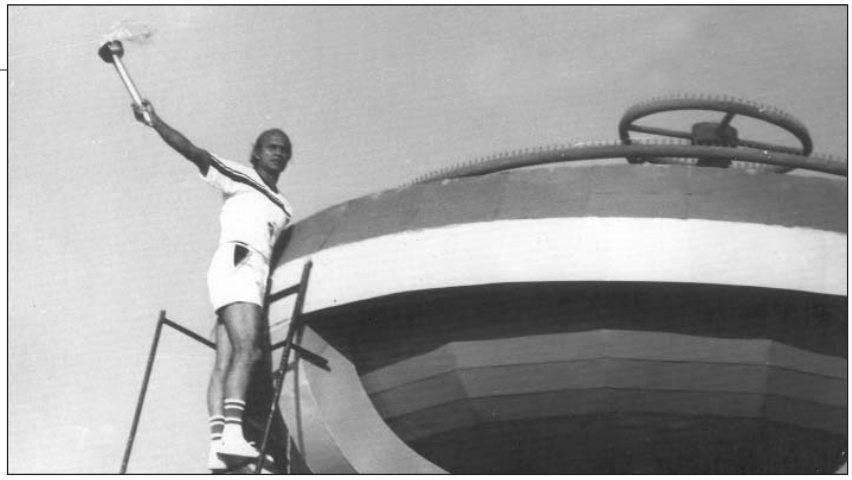

দ্বিতীয় সাফ গেমসের মশাল জ্বালাচ্ছেন কাজী আব্দুল আলীম

এককালে কাজী বাড়ি খুব বিখ্যাত ছিল। গুলিস্তানে এসে ঘোড়ার গাড়ি চালককে রোকনপুর কাজী বাড়ি বললেই নিয়ে আসতো কাজী বাড়ির দোরগোড়ায়। জন্মের পর থেকেই তিনি বসবাস করে আসছেন কাজী বাড়িতে। বিয়ে করেছিলেন পরিবারের পছন্দে। স্ত্রী জমিদার বংশের মেয়ে। দিনাজপুরের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব মৌলভী কাদের বখশের কন্যা। কাজী আবদুল আলীমের সকাল বেলায় মাঠ, দুপুর বেলায় ক্রীড়া চাকরি, বিকেলবেলায় মাঠ, আর রাতেরবেলায় লেখালেখি। এজন্য স্ত্রী খুব বেশি সময় পাননি স্বামীর কাছে। হয়তো এজন্য সারা জীবন অনুযোগও ছিল।

কাজী আবদুল আলীমের ২ ছেলে বর্তমানে জীবিত। তিনি জানান, ছেলেদের মধ্যে সাদউল্লাহ কাইয়ুম বাস্কেটবল খেলতো। নর্থ সাউথে পড়াশোনা করে এখন র‍্যাংগস-এ চাকরি করে। অপর ছেলে এহসানুল আলীম বাস্কেটবলে জাতীয় দলে খেলতো। হাইজাম্প-এ দেশে এহসান ফস ডেরি ফ্লপ নামে নতুন স্টাইল প্রবর্তন করেছে। বড় ছেলে কাজী এহতেশামুল আলীম মারা গেছে ১৯৮০ সালে।

কাজী আবদুল আলীম ঢাকায় কোনো বাড়ি করতে পারেননি। বাসায় জায়গা না হওয়ায় ছেলেদের অন্যত্র বাসা নিতে হয়েছে। ছেলে এহসানুল আলীম একটি রপ্তানিমুখী নিটিং কারখানা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ৯০-এর দশকে ১৩ দিনের একটি হরতালে বাপ-ছেলের নিটিং কারখানা নির্দিষ্ট সময়ে পণ্য পাঠাতে ব্যর্থ হয়। কোম্পানি পরে আর পণ্য গ্রহণ করেনি। কাজী আবদুল আলীম জানান, কারখানা এখন বন্ধ আছে, কিন্তু ঋণের বোঝা ক্রমশ বাড়ছে। বর্তমানে পৌনে দু'কোটি ঋণ হয়ে গেছে।

স্কুলের সনদপত্র অনুযায়ী, কাজী আবদুল আলীমের বর্তমান বয়স ৭১ বৎসর। সনদপত্রের চেয়ে প্রকৃত বয়স ২/১ বছর বেশি হবে তিনি জানান। দীর্ঘ ঋজু দেহধারী কাজী আবদুল আলীম এখন প্রতিদিন ভোরবেলায় নামাজ পড়ার মাধ্যমে দিনের কর্মসূচি শুরু করেন। আর শেষ করেন লেখালেখি ও পড়াশোনার মাধ্যমে। দিনেরবেলায় হাঁটাহাঁটি করেন, পরিবারের বিভিন্ন কাজে বাইরে যান। রাত ছাড়াও দিনের বেলায় কখনো কখনো লেখালেখি করেন।

তিনি জানান, বর্তমানে তিনি চারটি বিশ্বকোষ প্রণয়নের কাজ করছেন। কোষসমূহ হচ্ছে- বাণীর বিশ্বকোষ, হাসির বিশ্বকোষ, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিশ্বকোষ ও রূপকথার বিশ্বকোষ। অন্যান্য গ্রন্থের মতো প্রকাশক ও পরিবেশক তিনিই হবেন।

কাজী আবদুল আলীম বলেন, 'আমি বই পছন্দ করি। যেখানেই গেছি, বই সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করার চেষ্টা করেছি। ঢাকা শারীরিক শিক্ষা কলেজের লাইব্রেরিতে ক্রীড়া বিষয়ক গ্রন্থ প্রায় দেড় হাজার ছিল, আমি দায়িত্ব নেয়ার পর সংগ্রহের পরিমাণ দাঁড়ায় সাড়ে ১৬ হাজার। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, রাজশাহী শারীরিক শিক্ষা কলেজসহ যেখানেই থেকেছি, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে ক্রীড়া বিষয়ক গ্রন্থ সংগ্রহ করে গ্রন্থাগারে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বই আমি পছন্দ করি। আর এ জন্যে হয়তো বই লেখা সম্ভব হয়েছে।'

বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনে পরিচিত পত্রিকা 'ক্রীড়াজগৎ' প্রতিষ্ঠার সময় উদ্যোক্তাদের মধ্যে অন্যতম কাজী আবদুল আলীম। প্রথম ২টি সংখ্যার সম্পাদক ছিলেন। ক্রীড়া বিষয়ক অনেক প্রতিষ্ঠানের স্বাপ্নিক ছিলেন তিনি, যুক্ত ছিলেন প্রতিষ্ঠার সঙ্গে। শারীরিক শিক্ষাবিদ সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন তিনি এবং ১৫ বছর এ দায়িত্ব পালন করেন। জুডো প্রবর্তনে পালন করেন অন্যতম পথিকৃতের দায়িত্ব। বাংলাদেশ জুডো ফেডারেশনের সভাপতি ছিলেন। সাইক্লিং, শারীরিক শিক্ষা ইত্যাদি খেলা বিস্তারে তিনি বিশেষ ভূমিকা রাখেন।

১৯৫৫ সালে তৎকালীন পাকিস্তান অলিম্পিকে বাংলাদেশ দলের অধিনায়ক ছিলেন। এরপর বিভিন্ন সময়ে জাতীয় দলের অধিনায়ক, সহ-অধিনায়কের দায়িত্বসহ বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেন। ক্রীড়া ক্ষেত্রে তার অবদানের জন্য ইতিমধ্যে স্বাধীনতা পদক (১৯৯৩), জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার (১৯৭৭), শারীরিক শিক্ষাবিদ সমিতির সম্মাননা, মাহবুব উল্লাহ পুরস্কারসহ বিভিন্ন পদক ও পুরস্কারে তিনি ভূষিত হয়েছেন।

বাংলাদেশের খেলাধুলার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে তিনি বলেন, 'পরিবর্তনশীল আন্তর্জাতিক মানের কাছে বাংলাদেশ পিছিয়ে আছে। আন্তর্জাতিক মান ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা সেই অগ্রগতি এখন মেলাতে পারছি না। বিভিন্ন দেশে ক্রীড়া নিয়ে গবেষণা হয়, খেলার বিভিন্ন খুঁটিনাটি দিক নিয়ে গবেষণা হয়। কিন্তু বাংলাদেশে এ বিষয়টি উপেক্ষিত। বাংলাদেশ যত দিন গবেষণায় নজর দেবে না, ততদিন খেলায় আন্তর্জাতিক মানে যেতে পারবে না। পুরস্কার পাবে না। আমাদের দেশে ট্যালেন্ট আছে। খুঁজে বের করতে হবে, উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিতে হবে। দেশে শারীরিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হলেও তা নামে মাত্র। স্কুল মাঠে সেই শিক্ষক নেই। শহরের স্কুলগুলোতে দেখা যাচ্ছে, মাঠ ধ্বংস করে ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে। ভবনে কি হবে? পড়বে? খেলাধুলা ছাড়া শুধু পড়াশোনার মাধ্যমে ছাত্রদের বিকাশ পরিপূর্ণ হবে না। তারা মানুষ হতে পারবে না। স্কুলের মাঠে ভবন নির্মাণ করার প্রক্রিয়া এখনই বন্ধ করা প্রয়োজন। বন্ধ করা প্রয়োজন পার্ক ধ্বংস করার প্রক্রিয়া। কারণ পার্ক ও মাঠগুলো ধ্বংস করলে ছেলেমেয়েদের ক্রীড়া প্রতিভা বিকাশের সুযোগ আর থাকবে না। দেশে স্টেডিয়াম হচ্ছে। কিন্তু বছরের অধিকাংশ সময় স্টেডিয়ামগুলো কাজে লাগছে না। সারাবছর যাতে স্টেডিয়ামগুলো কাজে লাগে-এদিকে নজর দিতে হবে। শিক্ষার প্রতিটি স্তরে ক্রীড়া ও শারীরিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করতে হবে। পেশাধারী মনোভাবের চেয়ে সাধনার মনোভাব গড়ে তুলতে হবে। অলিম্পিক খেলায় কোনো পেশাধারী খেলোয়াড় অংশ নিতে পারে না। সাধনার মনোভাব গড়ে উঠলেই খেলোয়াড়রা ভালো করতে পারবে।'

কাজী আবদুল আলীম বর্ণনা করেন তাঁর নিজের জীবন। তিনি বলেন, 'সেন্ট গ্রেগরিতে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে ভর্তি হই ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে। স্কুলে একবার দৌড়ে ২য় স্থান অর্জন করেছিলাম। স্কুল জীবনে কঠিন টাইফয়েডে আক্রান্ত হই। এরপর দীর্ঘদিন আর খেলিনি। কলেজে উঠে ক্রীড়া বিষয়ে সাধনার পথে নামি। দ্রুত সাফল্য লাভ করি। সাধনা যে মানুষকে কতো পরিবর্তন করতে পারে, তার প্রমাণ আমি।'